শাহ্ আব্দুল হান্নান কর্তৃক কিছু

গ্রন্থ পর্যালোচনা

সংগ্রহে

বিআইআইটি

সূচি

ভবিষ্যতের সভ্যতা ইসলাম: ড. ইউসুফ কারযাভী	১
সীরাতে আয়েশা (রা.): একটি অসাধারণ বই	২
ইসলামি সভ্যতা পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা	৪
হাদিস যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া	৬
তাওহিদের বিস্তৃত ও সার্বিকরূপ	৭
দি মেসেজ অব দি কুরআন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির	১১
অনন্য এক গ্রন্থ আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব	১৪
জিহাদের সার্বিক তাৎপর্য: ড. কারজাবির বক্তব্য	১৬
ইউসুফ কারজাবির রাষ্ট্রচিন্তা	১৮

ভবিষ্যতের সভ্যতা ইসলাম: ড. ইউসুফ কারযাভী

ড. কারযাভী বলেন, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহর উপাসনা করা, পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা

আমরা সবাই ড. ইউসুফ আল কারযাভীকে জানি উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কলার হিসেবে। তার 'ইসলাম- দ্য ফিউচার সিভিলাইজেশন' বইয়ের সারাংশ তুলে ধরছি।

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি মানবসত্তার মতোই সভ্যতারও একটি দেহ এবং একটি আত্মা রয়েছে। দেহটা হলো সড়ক-জনপথ, ফ্যাক্টরি এবং দালানকোঠা। পশ্চিমা সভ্যতা এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়েছে।

অপর দিকে একটি সভ্যতার আত্মা হলো তার মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং ধ্যান-ধারণা। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতা ব্যর্থ হয়েছে, যার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা, বস্তুবাদী জীবনপদ্ধতি, ধর্মহীনতা (শিক্ষা ও ধর্মকে পরস্পর থেকে আলাদা করা), আল্লাহর দেয়া মানব প্রকৃতির (মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির) সাথে লড়াই এবং অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর চেয়ে নিজেদের উন্নত মনে করা।

তিনি বলেন, পশ্চিমা সভ্যতা মেশিন, যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। কিন্তু মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে খুব কমই কাজ করেছে।

এর ফলে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে কঠিন যৌন রোগ, এইডস, পরিবারের ভাঙন, বহুগামিতা, বিকল্প মাতৃত্ব (ভাড়ায় মাতৃত্ব), সন্তান নিতে না চাওয়া, স্ত্রী স্বামীর পরিবর্তে এমনকি কুকুরের সাথে বসবাস, সমলিঙ্গ পরিবার, একক পরিবার, একাকিত্ব, নৈরাজ্য, আত্মহত্যা, বেশি বেশি খুন ও অপরাধ প্রভৃতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মায় পচন ধরেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কারযাভী বলেছেন, মার্ক্সবাদ, বর্তমানকালের খ্রিষ্টবাদ, জুদাইজম (ইহুদিবাদ) কোনো সমাধান নয়। কেননা এগুলো ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নয়।

ইসলামই একমাত্র সমাধান। কারণ এটি সব ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ; এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয়, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সব মানুষের একত্বের ধারণা। ইসলাম আত্মশুদ্ধি ও অগ্রগতির ওপর গুরুত্বারোপ করে, সংহতি ও সহযোগিতার কথা বলে, সবার প্রতি সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করে, পরামর্শের মাধ্যমে সব বিষয় সমাধা করতে বলে।

এরপর ড. কারযাভী বলেন, মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আল্লাহর উপাসনা করা, পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা।

তিনি আরো কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছেন; যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা, ইসলামের সাথে ক্রুসেডের চেতনা ভুলে না যাওয়া, ইসলামোফোবিয়া, ইসলামের বিরুদ্ধে চরমপন্থী ইহুদিবাদীদের (Zionists) পরিকল্পনা, বর্তমানকালের মুসলিমদের দুর্বলতা এবং ইসলামি পুনর্জাগরণে আস্থা রাখা।

সীরাতে আয়েশা (রা.): একটি অসাধারণ বই

এর মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা:-এর জীবনীর ওপর সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ: রচিত 'সীরাতে আয়েশা রা.' গ্রন্থটি পড়লাম। সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী গত শতাব্দীর চলিশের দশকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন। তিনি বইটি উর্দুতে লিখেছেন এবং তার অনেক সংস্করণ ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ রাফিকুল ইসলাম এবং প্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা। ৫০০ পৃষ্ঠার এ বইটি পড়লে বোঝা যায়, হজরত আয়েশা রা.-এর বিবাহিত জীবন, বিভিন্ন খলিফার সময়ে তাঁর সামাজিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক ভূমিকা, কুরআনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান, হাদিস রেওয়ায়েত এবং হাদিস ব্যাখ্যায় তাঁর স্থান, ফিকাহ্, ফতোয়া ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান, তাঁর শিক্ষালয় ও ছাত্রছাত্রী, ইত্যাদি বিষয়।

কুরআন মজিদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি একজন। হজরত আয়েশা রা.-এর নিজস্ব কুরআনের মাসহাফ (কপি) ছিল, যা তিনি নিজে বলতেন এবং আবু ইউসুফ নামে একজন কর্মচারী তাঁর কথা শুনে লিখতেন (পৃষ্ঠা ২৫৫, সীরাতে আয়েশা)।

তিনি কুরআনের শ্রেষ্ঠ তাফসিরকারকদের একজন ছিলেন। হজরত আয়েশা রা: অনেক আয়াতের তাফসির করেছেন। এর কিছু সীরাতে আয়েশার ২৫৭-২৬৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়।

হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রেও হজরত আয়েশা রা. প্রধান সাতজন সাহাবির মধ্যে একজন, যারা দুই হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল অসামান্য। তাঁর বর্ণিত হাদিসকে অন্যদের বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেয়া

হতো। তিনি হাদিস বর্ণনায় খুবই সতর্ক ছিলেন এবং অন্য সাহাবাদের হাদিস বর্ণনায় ভুল হলে তিনি তা সংশোধন করতেন (পৃষ্ঠা ২৭৭-২৯৬)।

হজরত আয়েশা রা: ফিকাহের ক্ষেত্রে খুবই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইজতিহারদের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে (পৃষ্ঠা ২৯৮-৩১২)। অন্যান্য সাহাবা থেকে তিনি ফিকাহ ক্ষেত্রে যেসব মতপার্থক্য পোষণ করেছেন তার কিছু উদাহরণ এই পৃষ্ঠাগুলোতে দেয়া হয়েছে। তাঁর কাছে খলিফাদের ও শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের পক্ষ থেকে এবং সারা মুসলিম জাহান থেকে ফতোয়া চাওয়া হতো।

হজরত আয়েশা রা: মদিনায় তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। সেটি ছিল মসজিদে নববীর পাশের একটি ছাউনি। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অনেক সাহাবি যেমন আবু মূসা আশয়ারী, হজরত আবু হুরাইরা, ইবনে উমর, ইবনে আববাস। সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী হজরত আয়েশার পুরুষ ও নারী শিষ্যদের তালিকা দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৩৬৮-৩৭৬)।

নারীদের মধ্যে এবং পুরুষ নির্বিশেষে সাহাবিদের মধ্যে হজরত আয়েশার স্থান কী ছিল, সে সম্পর্কে আলামা ইবনে হাজাম বলেছেন, 'শুধু নারীদের মধ্যে নয়, সব সাহাবির মধ্যেও রাসূল সা:-এর পর তাঁর স্থান ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন, 'যদি জ্ঞান প্রজ্ঞার পূর্ণতা, ব্যাপক পরিসরে ধর্মীয় কার্যক্রম এবং রাসূল সা:-এর রেখে যাওয়া শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রচার-প্রসারের দিকটি সামনে আনা হয়, তা হলে হয়তো আয়েশা রা.-এর সমকক্ষ কেউ হতে পারেন না (সীরাতে আয়েশা, পৃষ্ঠা ৪১৬-৪১৭)।

রাসূলের সাথে বিবাহের সময় হজরত আয়েশা রা:-এর বয়স কত ছিল, এ ব্যাপারে সুলাইমান নদভী সাধারণভাবে বর্ণিত মতই গ্রহণ করেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯-১০ বছর। তবে তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলীর দেয়া ভিন্ন মত, অর্থাৎ তখন আয়েশা রা.-এর বয়স ছিল অন্তত ১৬, সে মত ও তার যুক্তিও দিয়েছেন। এর পর গত ৬০-৭০ বছর ধরে যে রিসার্চ হয়েছে তাতে এখন প্রায় সর্বসম্মত মত হচ্ছে, বিবাহের সময় হয়তো আয়েশা রা:-এর বয়স ছিল ১৬ বা তার বেশি।

আমি আশা করব, সবাই এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি পড়বেন।

ইসলামি সভ্যতা পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা

আমি সম্প্রতি 'মুসলিম সভ্যতা অবক্ষয়ের কারণ ও সংস্কারের আবশ্যকতা' শীর্ষক একটি অসাধারণ বই পড়লাম। বইয়ের লেখক স্বনামধন্য অর্থনীবিদ ইসলামি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজে কিং ফয়সাল পুরস্কার পাওয়া লেখক ড. এম উমর চাপড়া। বইটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (BIIT), থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ঠিকানা- বাড়ি নং ৪, রোড নং ২, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা।

ড. উমর চাপড়া এ বইটি যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লেস্টার এর অনুরোধে লিখেন। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি ইতিহাস ও সমাজবিদ ইবনে খলদুনের বই 'কিতাবুল ইবারের' ভূমিকা বা 'মুকাদ্দিমাহ' থেকে জাতির উন্নয়ন ও অবক্ষয় তত্ত্ব তুলে ধরেন। খলদুন বলেছেন যে, উন্নয়ন ও অবক্ষয়ে ন্যায়বিচার ও সম্পদের ভূমিকা রয়েছে। মুকাদ্দিমাতে ইবনে খলদুন যেসব মূলনীতি বলেছেন তা হচ্ছে যে- (১) জনগণের সমর্থনেই শাসক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; (২) ন্যায়বিচার ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়; (৩) উন্নয়ন ব্যতীত সম্পদ অর্জন করা যায় না; (৪) সম্পদ ছাড়া জনগণের সমস্যা সমাধান করা যায় না; (৫) শাসকের দায়িত্ব শরিয়ত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ ন্যায়বিচারের মাপকাঠিতেই মানুষের বিচার করবেন।

বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ড. উমর চাপড়া রাসূলুল্লাহর আগমনের পর কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিমদের যে উন্নয়ন হয়েছিল, তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। সে আমলে ইসলামের ভিত্তিতে ব্যক্তিপর্যায়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। মুসলিম শাসনাধীন সব এলাকা ছিল একটি সাধারণ বাজার (Common Market)। ফলে সব এলাকার দ্রুত উন্নয়ন হয়েছিল। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি হয়েছিল, নগরও সমৃদ্ধ হয়েছিল। জ্ঞান জগতের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল, অনেক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নতুন মাত্রা পেয়েছিল। স্বাধীন আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত তিনি মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের অবক্ষয়ের ধরন ও কারণ আলোচনা করেছেন। কিছু লেখক ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে ব্যাপক বণ্টনকে দায়ী করেছেন, এর ফলে পুঁজি গঠন হয় না। জাকাতকে এবং ওয়াকফকেও তারা দায়ী করেছেন। ড. উমর চাপড়া এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুসলমানদের অবক্ষয়ের কারণ ছিল নির্বাচিত খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, অবশ্য তারা খলিফা পদবিটি ধরে রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক ন্যায়পরায়ণ শাসকও তৈরি হয়েছিলেন যেমন- ওমর ইবনে আবদুল আজিজ আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ, নূরুদ্দীন শহীদ, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। শরিয়তের নিয়ন্ত্রণ এভাবে অব্যাহত ছিল।

তিনি অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন সরকারের আয় থেকে ব্যয় বেশি করা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক পদ-পদবি বিক্রয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থসহায়তায় ভাটা, বেসরকারি খাতের কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা। দার্শনিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী ও রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্ব। তারা এসব বিষয়ে বিতর্ক করছিল যে স্রষ্টার প্রকৃতি কী রূপ, সৃষ্টি কি স্রষ্টার মতো চিরন্তন, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি না কেবল 'কালাম'? এসব ছিল অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক, এসবের ওপর মূল ইমান নিভরশীল ছিল না।' এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইমাম গাজ্জালী, ইবনে রুশদ, ইবনে তাইমিয়া চেষ্টা করেন। যা-ই হোক এর ফলে শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্র স্থবির হয়ে পড়ে এবং নারীদের অবস্থার অবনতি হয়।

নবম অধ্যায়ে তিনি মুসলিমদের সম্ভাব্য সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে আলাপ করেছেন। তিনি নৈতিক সংস্কারকে প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন। ন্যায়বিচার, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উদ্যোগী হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি শিক্ষার প্রসারের ও ক্ষুদ্রঋণ বিস্তার করার কথা বলেছেন। তিনি রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যতই সময় লাগুক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। গণতন্ত্র ইসলামি খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু ইসলামি পুনর্জাগরণ মুসলিম বিশ্বে দানা বেঁধেছে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সেকুলারিজম কায়েম করার চেষ্টা তুরস্কে, তিউনিসিয়ায় সফল হয়নি। তবে ভবিষ্যতে ফিকাহকে স্থবিরতা থেকে উদ্ধার করতে হবে, এ কাজ অনেকটা হয়েও গেছে। ভবিষ্যতে ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

এ বইটি কয়েকবার পড়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি।

হাদিস যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া

আমি বহু আগে থেকেই রাসূল সা: থেকে বর্ণিত হাদিসের সনদ ও মতন (Text) যাচাই সম্পর্কে পড়াশোনা করছিলাম। এ সম্পর্কে প্রথম যে বই পড়ি, তা ছিল মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস'। তাতে তিনি অন্য অনেক বিষয়ের মধ্যে হাদিসের 'মতন' যাচাই করার নিয়মনীতি উল্লেখ করেছেন।

এরপর আমি উসুলুল ফিকাহ্ কয়েকটি বই পড়ি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিখ্যাত ইসলামি গবেষক চিন্তাবিদ ও আইনবিদ ড. হালিম কামালির 'ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স' বইটি, যেটির এখন বাংলা অনুবাদ হয়েছে, 'ইসলামী আইনের মূলনীতি' নামে। বইটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট বিআইআইটি হাউজ -৪, রোড-২, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা থেকে (টেলিফোন নং-৮৯২৪২৫৬) প্রকাশিত। এই বইয়ের উসুলুল ফিকাহ্ আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও হাদিসের শ্রেণিবিন্যাস, তাদের পরীক্ষার নিয়মনীতি এবং কী ধরনের হাদিস থেকে কী ধরনের আইন বের হতে পারে, তার আলোচনা হয়েছে। সব আলেম এবং ইসলামে আগ্রহী ব্যক্তিদের এ বই পড়া উচিত।

এ ব্যাপারে পরে আমি ইউসুফ আল কারদাবির বই 'কাইফা নাতা'য় 'মাল মায়া আল সুন্নাহ' বইটি ইংরেজিতে পড়ি। এখন এর বাংলা অনুবাদ বিআইআইটি থেকে 'সুন্নাহ্র সান্নিধ্য' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ বই। এই বইয়ের মাত্র একটি বিষয় আমি এ কলামে আলোচনা করব। তিনি বলেছেন, সুন্নাহ বা হাদিসের শত্রুরা নানাভাবে জাল হাদিস ছড়িয়েছে, হাদিসের অর্থ বিকৃত করেছে। এসব রোধ করার জন্য ইসলামের মুহাদ্দিসগণ সব ধরনের চেষ্টা করেছেন এবং সহিহ্ হাদিসকে দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে আলাদা করেছেন। এ যাচাই-বাছাই এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন, কিছু তফসির ও ফিকাহ্ গ্রন্থেও কিছু সূত্রবিহীন, অজানা হাদিস ঢুকে পড়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই গত একশত বছর ধরে বিশেষজ্ঞরা করেছেন এবং করছেন। তাদের কিছু কাজের উল্লেখ নিচে করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুর্বল হাদিস কোনো আইনের ভিত্তি হতে পারে না। ইসলামের দাওয়াতি কাজে, প্রচারের কাজে, জনগণকে আকর্ষণ করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে বেশির ভাগ ফিকাহবিদ একমত।

সুন্নাহর সেবক ফুয়াদ আব্দুল বাকী মুয়াত্তা, ইমাম মালিক, সহিহ মুসলিম ও সুনান ইবনে মাজাফে সম্পাদনা করেছেন। ইসমত উবায়িদ সুনান আবু দাউদ ও সুনান

তিরমিজি সম্পাদনা করেছেন। আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ নাসায়ীর সম্পাদনা করেছেন। শায়খ নাসিরউদ্দিন আলবানী হাদিস যাচাই-বাছাই করে সহিহ ইবনে মাজাহ, সহিহ আল তিরমিজি, সহিহ আন নাসায়ীকে সম্পাদনা করেছেন। মুক্তাদা আল আজামী ও আলবানী একত্রে সহিহ ইবনে খুযায়মাহ সম্পাদনা করেছেন।

আহ্মদ মুহাম্মদ শফির ১৫ খণ্ডে মুসনাদে আহমদের সনদ যাচাই-বাছাই করেছেন। শায়খ শফির ইবনে কাসিরের তফসিরে উল্লিখিত হাদিসেরও যাচাই-বাছাই করেছেন। তিনি এর নাম দেন 'উমদাত আল তাফসির'। আল বানী 'মিশকাত' এবং সূয়তীর 'সহিহ আল জামী আস সাগিরের' হাদিসগুলো পরীক্ষা করে সহিহ ও যয়িফ পৃথক করেন। এ ব্যাপারে আরো যে কাজ গত একশত বছরে হয়েছে, তার তালিকা 'সুন্নাতের সান্নিধ্যে' বইয়ের ৬১ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখতে পারেন।

আমার এ লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সব মাদরাসার এবং আলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেন তারা এসব বই সংগ্রহ করেন। লাইব্রেরিতে রাখেন, তাদের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করেন, রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করেন। এটা অত্যন্ত জরুরি, যাতে উম্মত কেবল সহিহের ওপর নিভর্র করে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আমল করতে পারে। আশা করি, সবাই এ বিষয়টি চিন্তা করবেন।

তাওহিদের বিস্তৃত ও সার্বিকরূপ

গত ছয় মাস ধরে ইসমাইল রাজী আল ফারুকীর বই 'আত তাওহীদ' ইংরেজি ও বাংলায় বারবার পড়লাম। কয়েক জায়গায় এ বইটি নিয়ে আলোচনাও করেছি। এ বইটি বাংলায় বেশি প্রচারিত হয়নি। অথচ এ বইয়ের লাখ লাখ কপি ছড়ানো দরকার ছিল। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)। বাড়ি ৪, রাস্তা ২, সেক্টর ৯, উত্তরা, ঢাকা, ফোন : ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০২-৫৮৯৫৭৫০৯। তাওহিদভিত্তিক জীবন কেমন, তার রূপরেখা কী- তার ওপর এর চেয়ে উন্নতমানের বই কোনো ভাষায় নেই বলে আমার মনে হয়। এর লেখক গত ১০০ বছরের ইসলামি চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের প্রথম ১০ জনের মধ্যে একজন বলেই আমি মনে করি।

এ বইয়ের সারমর্ম জনগণের সামনে উপস্থাপন করছি। লেখক প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের পর একদল দার্শনিক বলে থাকেন, সৃষ্টির পর স্রষ্টা কতগুলো প্রাকৃতিক আইন দিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ব ও আকাশমণ্ডল এর ভিত্তিতেই চলছে, এখন স্রষ্টার কোনো কাজ নেই, তাকে অলস বা কর্মহীন বলা যায়। লেখক

আল ফারুকী এসব ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, স্রষ্টা সবসময়ই তার কাজ করছেন, নিজে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল ফারুকী বলেছেন, তাওহিদ হচ্ছে ইসলামের সারনির্যাস। তাওহিদের অর্থ হচ্ছে- স্রষ্টা মাত্র একজন, অন্য সব কিছু তার সৃষ্টি। আল্লাহর পুত্রের ধারণা এবং দেবদেবীর ক্ষমতার ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইতিহাসের মৌলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইসলাম মানুষকে দিয়েছে কর্মবাদ, আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন সব ধরনের যোগ্যতা। সুতরাং মানুষকে কর্মের মাধ্যমে সভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে; ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে- এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়। রাসূল সা: এবং সাহাবিরা এটাই করেছিলেন। আল্লাহ রাসূল সা:-কে হুকুম দেন যেন কর্মের মাধ্যমে তিনি মানুষকে এবং ইতিহাসকে নতুন রূপ দেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক জ্ঞানের মূলসূত্র তুলে ধরেছেন। ঈমান শব্দটি আলিফ মিম নুন থেকে এসেছে। এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস নয়, সুদৃঢ় বিশ্বাস বা Conviction। ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে, যুক্তির কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ মনে হলে বারবার বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, আমি কি ওয়াহি সঠিকভাবে বুঝেছি বা যাকে যুক্তি বলছি, তা কি সত্যিই যুক্তিসঙ্গত? তা হলে এ সব আপাত বিরোধ থাকবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বলছেন, কোনো কোনো ধর্ম সৃষ্টিকে 'দুর্ঘটনা' মনে করেন। তারা মনে করে, জগৎ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই আসল লক্ষ্য হতে হবে। ইসলামে প্রকৃতি হচ্ছে সৃষ্টি, কিন্তু উদ্দেশ্যময়। সব কিছুর উদ্দেশ্য আছে। আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিক আইন দিয়েছেন। এসব আইনের ফলে যা ঘটে, তা একইভাবে ঘটে; ভিন্ন ভিন্নভাবে নয়। ফলে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টির পেছনে যেসব নিয়ম আছে, তা বের করতে পেরেছেন। ইসলাম বিজ্ঞানের শত্রু নয়, বরং আল্লাহ প্রাকৃতিক আইন দিয়েছেন বলেই বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। Allah is the condition of science.

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি নৈতিকতার ভিত্তি ও মূলনীতি আলোচনা করেছেন, যা প্রাকৃতিক আইনে হয় তাতে কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে মানবিক স্বাধীনতা রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমেই মানুষের নৈতিকতা বিবেচিত হয়। মানুষ জন্মগত পাপী নয়, যেমন কোনো কোনো ধর্মে বলেছে। ইসলাম বিশ্বজনীন; এখানে গোত্রবাদ, দেশপূজা নেই।

সপ্তম অধ্যায়ে তিনি সমাজব্যবস্থার মূলনীতি দিয়েছেন। ইসমাইল রাজী আল ফারুকী বলেছেন, সমাজব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামের হৃৎপিণ্ড। সমাজের মাধ্যমেই আল্লাহর অভিপ্রায় কার্যকর হয়। ইসলামি সমাজ ইহুদি ধর্মের মতো গোত্রীয় (tribal) নয়। সেকুলারিজম সমাজকে নীতিবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সেকুলারিজমের কোনো মূল্যবোধ নেই। এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম থেকে দূরে

থাকা, এই negative মূল্যবোধ। তিনি বলেন, আল্লাহর অভিপ্রায় হচ্ছে সমাজমুখী, সমাজকেন্দ্রিক। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল বা মুকাল্লিফ হতে বলে। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি মুসলিম উম্মাহ বা মুসলিম বিশ্বসমাজের মূলনীতি উল্লেখ করছেন। উম্মাহ আধুনিক অর্থে কোনো গ্রুপ নয় বা গোষ্ঠী নয়। উম্মাহ বিশ্বজনীন। মুসলিম উম্মাহ একটি শরীরের মতো, তার এক অঙ্গে ব্যথা লাগলে অন্য স্থানেও ব্যথা লাগে। উম্মাহর সম্ভাবনা অনেক। এটি গতিশীল ছিল, কিন্তু মুসলিম শাসক ও ফিকাহবিদেরা একে স্থবির করে ফেলেছেন।

নবম অধ্যায়ে তিনি ইসলামের পরিবারব্যবস্থার মূলনীতি আলোচনা করছেন। কমিউনিস্টরা পরিবারব্যবস্থা তুলে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। পাশ্চাত্যেও নানা কারণে পরিবার দুর্বল হয়ে গেছে, এটা না থাকার মতো। নৃতত্ত্ববিদেরা (anthropologists) তাদের ভুল তত্ত্ব দিয়ে মানব পরিবারকে দুর্বল করে ফেলেছেন। তারা মানুষকেও অন্য পশুদের মতো একটা পশু মনে করেন। সুতরাং পশুর যেমন পরিবারের দরকার নেই, তেমনি মানুষেরও পরিবার দরকার নেই। ইসলামে পরিবার এককও হতে পারে (পিতা-মাতা এবং সন্তানেরা) এবং extendedও হতে পারে যে পরিবারে দাদা-দাদী এবং অন্য কয়েকজন আত্মীয় থাকতে পারেন। নারী-পুরুষকে আল্লাহ ধর্মীয়, নৈতিক ও নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কুরআনের ৩:১৯৫, ৯:৭১-৭২, ১৬:৯৭, ৬০:১২, ৫:৩৮, ২৪: ২, এবং ৪:১২ আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ৪:৩৪ আয়াতে নারীকে কোনোভাবে ছোট করা হয়নি। তিনি নারী-পুরুষের মাঝে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতার উল্লেখ করেছেন। যেমন- নারীর ক্ষেত্রে তার মাতৃত্ব, গর্ভধারণ, সন্তান লালন-পালন গুরুত্বপূর্ণ। আবার পুরুষের ক্ষেত্রে পিতৃত্ব, ভরণপোষণের দায়িত্ব, রোজগার করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, যদিও বেশির ভাগ নারী মাতৃত্বের কঠিন দায়িত্ব ও গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীর জন্য শিক্ষা ও বাইরে কাজের সব সুযোগ থাকতে হবে। মধ্যবয়সের পর নারীদের মাতৃত্বের দায়িত্ব কমে যায়। সে ক্ষেত্রেও যাতে সে বাইরে কাজ পেতে পারে, সমাজকর্মে নিয়োজিত হতে পারে- তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দশম অধ্যায়ে তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উম্মাহর এক বা একাধিক রাষ্ট্র থাকতে হবে। ইসলামের খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে- জনগণের বাছাই করা বা নির্বাচিত শাসক থাকা, পরামর্শভিত্তিক শাসন (সে জন্য বর্তমান যুগে পার্লামেন্ট থাকা) ও রাষ্ট্রের মূল আইন ইসলামভিত্তিক হওয়া। বিচারব্যবস্থা স্বাধীন হওয়া এবং সব নাগরিকের নাগরিক অধিকার থাকা। মুসলিম সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সবার বৈষয়িক ও শিক্ষাগত প্রয়োজন পূর্ণ করা।

একাদশ অধ্যায়ে তিনি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামে এই জীবন ও পরজীবনের সমান অগ্রাধিকার রয়েছে। ইসলাম কর্মবাদে বিশ্বাস করে। এখানে সন্ত্রাসবাদ নেই। কোনো গোষ্ঠীর নয়, সবার কল্যাণ ইসলামি অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য। এ ব্যবস্থায় কাউকে শোষণ করা যাবে না; কিছু দেশ কর্তৃক অন্য সব দেশকে নানা কায়দায় বঞ্চিত করা যাবে না। উমর রা: সারা দেশের অভ্যন্তরীণ মাল চলাচলের ওপর শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন। ফলে মুসলিম বিশ্ব একটি সাধারণ বাজারে (common market) পরিণত হয়েছিল। উৎপাদনের নীতি হচ্ছে ক্ষতিকর কিছু তৈরি করা যাবে না। কেবল মুনাফার জন্য উৎপাদন নয়, তা জনহিতকরও হতে হবে। ভোগের ক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে, অপচয় না করা এবং একচেটিয়া বাণিজ্য ও মজুদদারিমুক্ত হওয়া, জাকাত দেয়া।

দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূলনীতি কী হবে, তা ইসলামের আলোকে উল্লেখ করেছেন। হিজরতের পর রাসূল সা: মদিনার সনদ ঘোষণা করেন, যা ছিল বিশ্বের প্রথম এবং সবচেয়ে নৈতিক সংবিধান। সে সনদে সব জাতিগোষ্ঠীর সম-অধিকার দেয়া হয়েছে। তিনি গোত্রীয় পরিচয় তুলে দেন এবং সব মুসলিমকে এক উম্মাহর অংশ ঘোষণা করেন। ইহুদিদেরকে অন্য একটি উম্মাহ ঘোষণা করা হয়। পরে রাসূল সা: নাজরানের খ্রিষ্টানদের এক উম্মাহ ঘোষণা করেন। পরবর্তী শাসকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধদেরও আলাদা আলাদা উম্মাহ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লেখক ইসলামি আর্ট ও চিত্রশিল্পের মূলনীতি তুলে ধরেন। তিনি গান ও বাদ্য নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করেননি। এ বিষয়টি ড. কারজাবির 'হালাল ও হারাম' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রিকদের অনুকরণে প্রতিমা তৈরি ও অঙ্কনকেই প্রধান শিল্প মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম কোনো ধরনের প্রতিমাকে গ্রহণ করেনি। ইসলামি শিল্পীরা লতা-পাতার ও জ্যামিতির বিভিন্ন রেখা ও ফর্মের পুনরাবৃত্তির (repeatation) মাধ্যমে চিত্রশিল্প তৈরি করেছেন যা বিভিন্ন স্থাপত্যে, মসজিদে, দেয়ালে, গ্রন্থের প্রচ্ছদ ইত্যাদিতে দেখা যায়। একে স্টাইলাইজেশন (Stylization) বা অ্যারাবেস্ক (Arabex) বলে। এ ছাড়া মুসলিম শিল্পীরা কুরআনের সুন্দর তিলাওয়াতকে শিল্প বানিয়ে ফেলেছেন। আরবি লেখাকে সুন্দর করে Calligraphy তৈরি করা হয়।

পরিশেষে বলব, উপরের সারসংক্ষেপ তাদের সাহায্য করবে যারা এ মহৎ গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ পাননি।

দি মেসেজ অব দি কুরআন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির

মুহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯৪) 'দি মেসেজ অব দি কুরআন' তাফসিরটি লিখেছেন। তার লেখার সাথে আমি ১৯৬১ সালের দিকে পরিচিত হই। সে সময় লাহোরে ফাইন্যান্স সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিংরত ছিলাম। সে অ্যাকাডেমির লাইব্রেরিতে মুহাম্মদ আসাদের বইগুলো ছিল। আমি তার The Principles of State and Government in Islam (ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার) বইটি পড়ি। এটি আধুনিক কালে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর রচিত প্রধান কয়েকটি বইয়ের একটি। এরপর তার Islam at the Crossroads (সঙ্ঘাতের মুখে ইসলাম) বইটি পড়ি। এতে তিনি আধুনিক যুগে ইসলাম যে সমস্যার সম্মুখীন, সেগুলো এবং এর সমাধান কী, সেসব বিষয় তুলে ধরেছেন। এ সময়েই তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Road to Mecca (মক্কার পথ) আমি পড়েছি। এ বইয়ে তার জীবনী, তার অভিজ্ঞতা এবং ইসলাম সম্পর্কে তার বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হয়েছে। The Message of the Quran (কুরআনের মর্মবাণী) আরো আগে পড়েছিলাম। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং এর কপি ১৯৬৬ অথবা ৬৭ সালে হাতে আসে। আমি এর অনুবাদে মুগ্ধ হই। আমার মনে আছে, ইসলামি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশিদ আহমদ আমাকে কোনো একসময় বলেছিলেন, আসাদের অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ অনুবাদ।

মুহাম্মদ আসাদের এ তাফসিরের অনুবাদে ষরঃবৎধ বা শাব্দিক অর্থ না করে বরং মর্মবাণী তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের অনুবাদ মাওলানা মওদূদী তার 'তাফহীমুল কুরআনে' করেছেন। তিনিও তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদে মূল্যভাব তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আসাদ অবশ্য তার তাফসিরের নোটে (যেখানে তিনি শাব্দিক অনুবাদ করেননি, সে ক্ষেত্রে) শাব্দিক অনুবাদও দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা শাব্দিক অনুবাদ চান, তারা এ তাফসিরে শাব্দিক অনুবাদ পেয়ে যাবেন। মুহাম্মদ আসাদ এমন এক মহান ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও দু'টি বিদেশী ভাষা আরবি ও ইংরেজিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। আসাদের আরবি ও ইংরেজি যথাক্রমে আরব ও ইংরেজদের থেকেও উন্নত। এটি একটি অসাধারণ বিস্ময়।

মুহাম্মদ আসাদ তার তাফসিরে সংক্ষেপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোট সংযোজন করেছেন। এসব নোটে তিনি যে শুধু তার নিজের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে বিতর্কমূলক বিষয়গুলোতে পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতও

তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধারার প্রতিনিধি। অবশ্য তিনি কোথাও আমার জানা মতে, ইসলামের মূল spirit বা ভাব থেকে সরে যাননি কিংবা অকারণে অন্য সভ্যতার কাছে নতজানু হননি, যদিও কেউ কেউ এ রকম মনে করে থাকেন। তার তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নারী পুরুষ বৈষম্য (gender bias) মুক্ত। এটি তার সাফল্য। অনেক তাফসিরে এটি দেখা যায় না।

উদাহরণ: সূরা নিসার প্রথম আয়াতের অনুবাদ ও তার নোট দ্রষ্টব্য। তিনি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এভাবে-

O mankind! Be conscious of your Sustainer, Who has created you out of one living entity, and out of it created its mate and out of the two spread abroad a multitude of men and women.

এর ওপর সূরা নিসার এক নম্বর নোট দিচ্ছেন এভাবে- 'নফস'-এর যেসব বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আত্মা, মন, জীবিত প্রাণ, জীবন্ত সত্তা, মানুষ, ব্যক্তি, নিজ (ব্যক্তিগত পরিচয় হিসেবে), মানবজাতি, জীবনের মূল, মূলনীতি ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রাচীন তাফসিরকারগণ 'মানুষ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন যে, এটি হচ্ছে আদম। কিন্তু মুহাম্মদ আবদুহু এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন (মানার চতুর্থ খণ্ড) এবং এর পরিবর্তে 'মানবজাতিকে' প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এ অর্থ দ্বারা মানবজাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যা এ আয়াতের বক্তব্যের লক্ষ্য। একই সাথে তিনি অযৌক্তিকভাবে একে বাইবেলে বর্ণিত আদম ও হাওয়া সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিতও করেননি। আমার অনুবাদে আমি 'জীবিতসত্তা' (living entity) ব্যবহার করেছি, একই যুক্তির ভিত্তিতে। 'জাওজাহা' (তার সঙ্গী) সম্পর্কে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, জীবজন্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে 'জওজ' (জোড়া, জোড়ার একজন বা একজন সঙ্গী) পুরুষ ও নারী, দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় অথবা পুরুষ-স্ত্রী বোঝায়। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে এটি বোঝায় একজন নারীর সঙ্গী (স্বামী) এবং একজন পুরুষের সঙ্গী (স্ত্রী)। আবু মুসলিম থেকে রাজি উল্লেখ করেছেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সাথী (অর্থাৎ যৌনসঙ্গী) এর নিজ জাতি থেকে (মিন জিনসাহা)', এটা উপরোল্লিখিত মুহাম্মদ আবদুহুর মতকে সমর্থন করে। 'মিনহা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'এর থেকে' স্পষ্ট করে আয়াতের শব্দের সাথে সঙ্গতি রেখে, জীববিজ্ঞানের এ সত্য যে, দুই লিঙ্গই (পুরুষ ও নারী) একই 'জীবন্ত সত্তা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আসাদ তার তাফসিরে অনেকগুলো বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু কুরআনের আয়াতের অর্থের আওতাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দাসীদের বিবাহের

মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং হুর সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়। সূরা নিসার ২৪ নম্বর আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ তিনি এভাবে করেছেন-

And (forbidden to you are) all married women other than those whom you rightfully posses (through wedlock).

এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা নিসার ২৬ নম্বর নোটে বলেন, প্রায় সব তাফসিরকারের মতে, ওপরের পরিপ্রেক্ষিতে 'আল মুহসানাত'-এর অর্থ 'বিবাহিত নারী' যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে 'মা মালাকাত আইমানুকুম' (তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক অর্থাৎ যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে মালিক) দ্বারা প্রায়ই জিহাদে ধৃত নারী দাসীদের বোঝানো হয় (৮:৬৭ আয়াতের নোটটি দেখুন)। যেসব তাফসিরকারক এ অর্থ নিয়েছেন, তারা মনে করেন যে, এমন নারীকে বিবাহ করা যায়, তাদের মূল দেশে তাদের স্বামী থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এর বৈধতার বিষয়ে নবীর সাহাবিদের মধ্যে এবং পরে অন্যদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ ছাড়াও বেশ কয়েকজন উচ্চপর্যায়ের তাফসিরকার মনে করেন 'মা মালাকাত আইমানুকুম'-এর অর্থ এখানে 'যাদেরকে তোমরা বিবাহের মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে অধিকারী হয়েছে'- এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজি এ আয়াতের এবং তাবারি তার এক ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং অন্যদের উল্লেখ করে)। রাজি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে 'বিবাহিত নারীর' (আল মুহসানাত মিনান নিসা) উল্লেখ (যেহেতু তা নিষিদ্ধ নারীর উল্লেখের পর এসেছে) করা এ বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য যে, একজনের বৈধ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে যৌনসহবাস নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আসাদের সূরা মুমিনুনের তাফসিরের ৩ নম্বর নোটও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেখানে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তেমনিভাবে 'হুর' সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সূরা ওয়াকিয়ার ৮ নম্বর নোটে লিখেছেন- বিশেষ্য 'হুর' শব্দটির আমি অনুবাদ করেছি 'জীবনসঙ্গী'। এ শব্দটি পুংলিঙ্গ 'আহওয়ার' এবং স্ত্রী লিঙ্গ 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। আহওয়ার এবং হাওরা দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি 'হাওয়ার' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'হাওয়ার' দ্বারা প্রধানত বোঝায় 'চোখের গভীরভাবে সাদা হওয়া এবং চোখের মণির উজ্জ্বল কালো হওয়া (কামুস)।' সাধারণ অর্থে 'হাওয়ার' দ্বারা বোঝায় শুধু সাদা হওয়া (আসাস) অথবা একটি নৈতিক গুণ হিসেবে 'পবিত্রা' (তাবারি, রাজি এবং ইবনে কাসিরে ৩:৫২ আয়াতের 'হাওয়ারিউন', শব্দের ওপর আলোচনা)। সুতরাং যুগ্মশব্দ 'হুর ইন' দ্বারা মোটামুটিভাবে বোঝায় 'পবিত্র ব্যক্তিগণ (বা আরো স্পষ্টভাবে পবিত্র সঙ্গী), যাদের চোখ খুব সুন্দর (এটি হচ্ছে 'ইন' শব্দের অর্থ, এ শব্দটি 'আয়ান' শব্দের বহুবচন)'।

সাধারণভাবে হুর দ্বারা সাধারণত নারী বোঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, আগে যুগের বেশ কয়েকজন তাফসিরকার, যাদের মধ্যে হাসান আল বসরিও রয়েছেন, এর অর্থ করেছেন 'মানবজাতির মধ্যে সৎকর্মশীল নারীরা' (তাবারি)। এমনকি বিগত ঐসব দাঁতহীন মেয়েরাও 'নতুন মানুষ' হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন (আল হাসানকে এভাবেই রাজি উল্লেখ করেছেন তার তাফসিরে ৪৪:৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

মুহাম্মদ আসাদের পুরো তাফসিরটিই একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। মুহাম্মদ আসাদ তার তাফসিরের শেষে চারটি সংযোজনী যোগ করেছেন। এসব সংযোজনীর বিষয় হচ্ছে- 'কুরআনের রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার', 'আল মুকাত্তায়া', 'জিন' এবং মিরাজ' সম্পর্কে। এ সবকয়টিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী।

কুরআনের তাফসিরে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সবসময়ই ছিল ও থাকবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ খুবই স্বাভাবিক। বড় চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে এটা সবসময়ই হয়েছে। যারাই তাফসির সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদের অবশ্যই মুহাম্মদ আসাদের তাফসির পড়া উচিত, যেমন পড়া উচিত এ যুগের এবং অতীতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরগুলো।

অনন্য এক গ্রন্থ আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব

ইসলাম গ্রহণকারী পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের লেখা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকি। তাদের মধ্যে রয়েছেন- মুহাম্মদ আসাদ, মরিয়ম জামিলা প্রমুখ। এর মধ্যে সাবেক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান রায়ে নাস্তিক, জেফরি ল্যাং-য়ের বই Struggling to Surrender-এর বাংলা অনুবাদ 'আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব' পড়লাম। সার্বিক বিবেচনায় এটি এক অনন্য বই। বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT)। বাড়ি নম্বর-৪, রোড নম্বর-২, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা (টেলিফোন নম্বর : ৮৯১৭৫০৯)।

জেফরি ল্যাং পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে তার ইসলাম গ্রহণের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি স্কুলজীবনের শেষ দিকে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে তার জীবনে অল্প বয়সেই স্বপ্ন দেখতেন যে, তিনি নামাজ পড়ছেন। তিনি পিএইচডি শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে একজন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী আরব মুসলিম মাহমুদ কানদিলের সাথে পরিচয় হয়। তার মাধ্যমেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হন এবং শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আল কুরআন পড়ার ফলে যে অনুভূতি হয়, তার আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ইসলাম যুক্তির ওপর জোর দিয়েছে। কুরআনে ৫০ জায়গায় 'আকালা'র (যুক্তির) কথা এসেছে। তবে মুসলমানদের অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ওহিলব্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ কুরআনের নিকটই যেতে হবে।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বাইবেল ও কুরআনের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। তিনি কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে বলেছেন, কুরআনে বিজ্ঞানবিরোধী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। তবে কুরআন বিজ্ঞানের বই নয়, হেদায়েতের বই। এ অধ্যায়ে তিনি কুরআনে ব্যবহৃত রূপক, কুরআনের অনুপম বৈশিষ্ট্য এবং মানবজীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি রাসূল সা: এবং হাদিস শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাদিসের সব ধরনের সমালোচনার তিনি উত্তর দিয়েছেন। জাল হাদিস ও দুর্বল হাদিস চিহ্নিত করার জন্য মুসলিম পণ্ডিতদের অসাধারণ প্রচেষ্টার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এ কাজ এখনো জারি আছে। এ প্রসঙ্গে আমরা ড. ইউসুফ আল কারজাবির 'সুন্নাহর সান্নিধ্যে' বইয়ের উল্লেখ করতে পারি; যেখানে তিনি সুন্নাহ যাচাই ও গ্রহণের ৯টি নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে- কুরআনের আলোকে হাদিস বুঝতে হবে; কুরআন-বিরোধী কোনো হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

এ অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করেন, রাসূল সা:কে কুরআনের আলোকে চিনতে হবে এবং তার সম্পর্কে অপ্রামাণ্য কোনো কাহিনী গ্রহণ করা যাবে না (পৃ. ১০৬-৮)।

চতুর্থ অধ্যায়ে জেফরি ল্যাং মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম ভৌগোলিক পরিচয় এবং গোত্রবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। এখানে কালো-সাদা পার্থক্য নেই। পরিবারকে ইসলাম সার্বিকভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি নারীদের প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহর খলিফা হিসেবে, মানুষ হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে নারী-পুরুষ সমান। মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে, নারী-পুরুষ হিসেবে নয়। তিনি মনে করেন, মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা তত ভালো নয়; তাদের ওপর বিধিনিষেধ অনেক বেশি। কুরআনের আলোকে তাদের অবস্থা আরো উন্নত করতে হবে।

এ অধ্যায়ে তিনি মুসলিম নারীর পোশাক, নারী নেতৃত্ব, নারীর সাক্ষ্য, নারীদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এসব ব্যাপারে ড. জামাল বাদাবির মত সমর্থন করেছেন।

তিনি এ অধ্যায়ে জিহাদ ও রিদ্দা (ধর্মত্যাগ) নিয়েও আলোচনা করেছেন। রিদ্দা বা ইসলাম ত্যাগের ব্যাপারে তিনি ওইসব মুসলিম পণ্ডিতের মত সমর্থন করেছেন, যারা বলেছেন যে, ইসলাম ত্যাগ করে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না, তাদের কোনো শাস্তি হবে না।

বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাবিদদের ভিন্নমত থাকা অস্বাভাবিক নয়। যা হোক, এ বইটি সবার পড়া উচিত বলেই মনে করি।

জিহাদের সার্বিক তাৎপর্য: ড. কারজাবির বক্তব্য

ড. ইউসুফ আল কারজাবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর একটি হচ্ছে 'ফিকহুজ জিহাদ' বা 'জিহাদের বিধান'। এটি এখনো ইংরেজি বা বাংলায় অনূদিত হয়নি। তবে বইয়ের সারসংক্ষেপ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ওপর আরেকজন বড় ইসলামি চিন্তাবিদ তিউনিসিয়ার ড. রশদি আল ঘানুসি ২০০৯ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটিও ইন্টারনেটে পাওয়া যায় (Shoncharon.com দেখুন)। এ প্রবন্ধ থেকেই আমি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিচে তুলে ধরছি।

ড. কারজাবি জিহাদ সম্পর্কে গবেষণা করতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপ–

১. কুরআন ও সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল সুন্নাহর ওপর নিভর্র করা। দুর্বল কোনো প্রমাণ গ্রহণ না করা।

২. ইসলামের ব্যাপক ফিকাহ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করা। কোনো বিশেষ মাজহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। তারপর সবচেয়ে উপযুক্ত মত গ্রহণ।

৩. ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের এবং আইনব্যবস্থার তুলনামূলক অধ্যয়ন করা।

৪. দাওয়া, শিক্ষাদান, রিসার্চ, ফতোয়া, সংস্কার ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে 'ওয়াসতিয়া' বা মধ্যপন্থা গ্রহণ করা। আজকের সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদকে ব্যবহার করা; যেমন– পূর্বকালে সে যুগের ফকিহরা তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

জিহাদের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, জিহাদ ও কিতাল (যুদ্ধ)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মক্কাতেই জিহাদের আয়াত নাজিল হয়। কিন্তু তখন কিতাল ছিল না। তখন জিহাদ ছিল দাওয়ার। ড. কারজাবি ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইবনুল কাইয়িমকে উল্লেখ করে বলেন, কিতাল ছাড়াও জিহাদের ১৩টি পর্যায় রয়েছে। জিহাদ বিল নাফসের চারটি পর্যায়, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের দুটি পর্যায়, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি পর্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের তিনটি পর্যায় (হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা) রয়েছে।

ড. কারজাবি আধুনিককালে পার্টি, পার্লামেন্ট, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অত্যাচার বন্ধ করার প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বলছেন। তিনি নানা পদ্ধতিতে সাংস্কৃতিক জিহাদের কথাও বলেছেন (ইসলামি সেন্টার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)।

জিহাদের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলাম আত্মরক্ষামূলক জিহাদের কথা বলেছে। যদিও পূর্বে আক্রমণাত্মক জিহাদের পক্ষেও অনেকে বলেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের পূর্বের ফকিহরা যে আক্রমণাত্মক জিহাদের কথা বলেছেন, তার ভিত্তি কুরআন বা সুন্নাহ নয় বরং তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা। তখন সব রাষ্ট্র পরস্পর সঙ্ঘাতে লিপ্ত ছিল। কোনো সর্বস্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইন ছিল না।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন–

১. সূরা তাওবায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তা সাধারণ আদেশ ছিল না। সেটা ছিল আরব মুশরিকদের একটি দলের বিরুদ্ধে।

২. সামরিক জিহাদ সালাত ও সিয়ামের মতো সবার ওপর ব্যক্তিগত ফরজ নয়। ব্যক্তিগত জিহাদের কথা সূরা বাকারা, সূরা আনফাল, সূরা মুমিনুল, সূরা রাদ, সূরা লুকমান, সূরা ফুরকান বা সূরা জরিয়াতে মুত্তাকিদের গুণাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩. যদি মুসলিমরা নিরাপদ থাকে তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা বৈধ নয়।

৪. ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

৫. ইসলাম আন্তর্জাতিক আইনের প্রণয়ন, জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়। মুসিলমরা আন্তর্জাতিক আইন স্বীকার করে নেয়ায় এখন অন্য কোনো রাষ্ট্রের ওপর হামলার কোনো বৈধতা নেই।

ড: কারজাবি বলেন, বর্তমান অমুসলিম বিশ্বকে দারুল আহাদ (চুক্তিবদ্ধ দেশ) মনে করতে হবে। কেননা সব দেশই এখন জাতিসঙ্ঘের আওতায় নানা চুক্তিতে আবদ্ধ।

ড. কারজাবি আরো বলেন, ইরহাব বা সন্ত্রাস আর জিহাদ এক নয়। সব ধরনের সন্ত্রাস ইসলামে নিষিদ্ধ। এর ব্যতিক্রম শুধু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা এ ধরনের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

এরপর তিনি ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধে যেসব নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে তার আলোচনা করেন।

১. যুদ্ধে অবৈধভাবে শত্রুকে প্রলোভিত করার জন্য অবৈধ পন্থা; যেমন মদ বা যৌনতা (Sex) ব্যবহার করা যাবে না।

২. প্রথমে আক্রমণ করা যাবে না; যেমন– কুরআনের ২:১৯০ আয়াতে বলা হয়েছে।

৩. চুক্তি রক্ষা করতে হবে।

৪. দালান-কোঠা নষ্ট করা এবং গাছ ও ফসল কাটা যাবে না।

৫. আণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ; কেননা এতে যারা যোদ্ধা নন তারাও নিহত হন।

আশা করি, বর্তমান প্রেক্ষিতে জিহাদের বিভিন্ন দিক এ লেখায় সুস্পষ্ট হয়েছে।

ইউসুফ কারজাবির রাষ্ট্রচিন্তা

ড. ইউসুফ আল কারজাবির জন্ম ১৯২৬ সালে। ১৯৭৩ সালে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন অব ইসলামিক স্কলারসের সভাপতি। এ পর্যন্ত তার ৪২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০টির মতো বাংলায় পাওয়া যায়।

এ নিবন্ধে আমি তার 'ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বইটি নিয়ে আলোচনা করব। বইটির মূল আরবি নাম 'মিন ফিকহি আদ দাওলাহ ফিল ইসলাম'। বইটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) প্রকাশ করেছে। তাদের ঠিকানা– রোড নম্বর-২, হাউজ নম্বর-৪, সেক্টর-৯, উত্তরা।

তিনি প্রথম অধ্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমেই বলেন, 'পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এ কথা মুসলিমদের মনে ঢুকিয়ে দিতে সুযোগ হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে ইসলাম কিছু বিধিবিধান সংবলিত ধর্মমাত্র। রাষ্ট্র

পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় বিধানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে। এখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই (পৃ-১)।

তিনি আরো বলেন, 'তাদের ভ্রান্ত স্লোগান হচ্ছে, ধর্ম আল্লাহর এবং রাষ্ট্র সবার।' এর ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়। এ স্লোগানকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে আমরা বলতে পারি, 'ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়ই আল্লাহর জন্য' অথবা এও বলতে পারি, 'ধর্ম সবার জন্য এবং রাষ্ট্র আল্লাহর জন্য।'

ড. কারজাবি প্রথম অধ্যায়ে কুরআন, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের প্রকৃতি থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে দলিল-প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সূরা নিসার আয়াত পেশ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো' (নিসা : ৫৮-৫৯)।

ইতিহাস থেকে তিনি বলেন, রাসূল সা: প্রথম থেকেই একটি নির্ভেজাল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন এবং প্রথম সুযোগেই তিনি মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র স্থাপন করেন (পৃ:-৬)। রাসূল সা:-এর ওফাতের পর মুসলিমরা প্রথমে যে কাজটি করেন, তা হচ্ছে তাদের রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচন করা। এটি রাষ্ট্রের গুরুত্ব প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি দেখাচ্ছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্র কোনো থিওক্র্যাসি তথা নেতা বা আলেম শাসিত রাষ্ট্র নয়। এটি একটি নাগরিক ও দেওয়ানি রাষ্ট্র। এটি একটি সাংবিধানিক ও আইনগত রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র রাজতন্ত্র নয়, পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। তিনি বলেন, ইসলামি রাষ্ট্র গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামি রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুলিপি। ইসলামি রাষ্ট্র একটি হেদায়াত ও কল্যাণকর রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র অসহায় ও দুর্বলদের আশ্রয়স্থল। এটি স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের রাষ্ট্র এবং এটি একটি চারিত্রিক ও আদর্শিক রাষ্ট্র (পৃ: ২৬-৫৮)।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি একটি বেসামরিক ও নাগরিক রাষ্ট্র। এটি থিওক্র্যাসি নয়। সেকুলারপন্থীদের দাবি– ইসলাম একটি ধর্মীয় পুরোহিত শাসিত রাষ্ট্রের কথা বলেছে। এ সন্দেহ তিনি শক্তভাবে দূর করেন। এমনকি তিনি ইরানকে যারা পুরোহিততন্ত্র বলতে চান, তার বিরুদ্ধেও তিনি বলেন, ইরান মূলত একটি নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (পৃ: ৬৪-৮৪)।

চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কিছু ভুল চিন্তার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অনেকে মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তা করা যায়। তিনি অনেক প্রমাণ দেন যে, খলিফারা একে অপরের সিদ্ধান্ত যুগের প্রেক্ষিতের আলোকে পরিবর্তন করেছেন। তিনি আরো

বলেন, এটি বিদআত নয়। সত্যিকারের বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামে বর্ণিত বিদআতের পরিধি শুধু আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও তৎসংশিণ্টষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জীবনপথে চলতে গিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত বিভিন্ন বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, কৃষ্টি-কালচার এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকসহ নানাবিধ বিষয়ে বিদআতের কোনো অংশ নেই' (পৃ:-৯৭-১০০)।

তিনি আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান মোতাবেক আমল করা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে তিনি সূরা আজহারের ৩৬ আয়াত (৩৩:৩৬) ও মায়েদার ৪৪-৪৭ (৫:৪৪-৪৭) উল্লেখ করেছেন। মায়েদার আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন মোতাবেক শাসন করে না, তারা কাফের, জালেম ও ফাসেক।' ইসলামের প্রায় সব আলেম এমত দিয়েছেন যে, যদিও আয়াতগুলো বনি ইসরাইলকে লক্ষ্য করে নাজেল করা হয়েছিল, তথাপি বিষয়বস্তু সর্বজনীন হওয়ায় তা মুসলিমদের ওপরও প্রযোজ্য। তবে ড. কারজাবি বলেছেন, এখানে কাফের অর্থ অবিশ্বাসী হবে না, যদি তারা বাধ্য হয়ে ইসলামি আইন প্রয়োগ করতে না পারেন। তিনি শাসকদের দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। এক দল, যারা ইসলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে এবং আরেক দল, যারা বাধ্য হয়ে ইসলামি আইন চালু করতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি অনেক বিষয় এনেছেন। প্রথমত, গণতন্ত্রকে তিনি ইসলামের সাথে সঙ্গতিশীল মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন, গণতন্ত্রের মূল কথা ইসলামের সাথে নীতিগতভাবে এক। অবশ্য ইসলামি গণতন্ত্রে মূল আইন ইসলাম হবে। গণতন্ত্রের শাসন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত আছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার (পৃ: ১৮৮-১৯১)। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এ যুগে এবং পূর্বে মুসলিম উম্মাহর দুর্দশার কারণ ছিল অগণতান্ত্রিক এবং স্বেচ্ছাচারী শাসন। তিনি এটাও উল্লেখ করেন, শূরা করা বা পরামর্শ গ্রহণ শুধু দিকনির্দেশক নয়। তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক (পৃ: ১৯৪-১৯৫)। তিনি উল্লেখ করেন, বহুদলীয় গণতন্ত্র ইসলামসম্মত। তিনি বলেন, রাজনীতিতে একাধিক দল ফিকাহর একাধিক মাজহাবতুল্য (পৃ: ২০২-২০৪)।

তিনি মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের সব যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, যা তারা আধুনিক গণতন্ত্রের সব পদেই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (পৃ: ২১৭-২৪১)। তিনি অমুসলিমদের পক্ষেও একই ধরনের মতামত দিয়েছেন (পৃ: ২৬৯-২৭৮)।

এ বইটি সবাইকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।